OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 333 - 341*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 333 - 341*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# সংস্কৃতি, নারী, ও রোকেয়া : একটি নারীবাদী পাঠ

লাকী কর
গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : lakikar29101995@gmail.com

***Received Date*** *16. 06. 2024*
***Selection Date*** *20. 07. 2024*

***Keyword***
*Culture, Education, Gender, Patriarchy, Empowermen.*

***Abstract***
*Rokeya can be considered as Bengal's first Muslim feminist thinker, writer and educationist who pioneered in her efforts to support female education and women's empowerment. She was the first person in colonial Bengal who advocated for a direct connection between education and the progress and emancipation of women. She staunchly supported the fact that appropriate imparting of education will enlighten women and help them to unshackle themselves from the barricades of the rigid patriarchal and chauvinist norms of the society. Rokeya wrote extensively for the cause of women's liberation and empowerment. "Stree Jaatir Obonoti" is a noteworthy literary creation of Rokeya where she meticulously outlines the inequality of the patriarchal culture, highlights the agony women faces due to patriarchal oppression, and points out several ways of women's emancipation from the patriarchal norms. Throughout her life, Rokeya visualized and endeavored an emancipatory world for women. Consequently, in the light of "Stree Jaatir Obonoti", this research paper attempts to trace how Rokeya advocated the issue of women's empowerment as a system of their emancipation from the rigid patriarchal structure. The paper also aims to problematize the methods of empowerment as suggested by Rokeya in her essay and question whether indicators like education and financial independence can truly liberate women in this patriarchal social structure.*

## Discussion

সমাজের অপরিহার্য অংশ হয়েও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নারী আজও অবদমিত। আজও তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত হয়, যাবতীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকে পুরুষের হাতে। ফলস্বরূপ নারীর প্রতি অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন অব্যাহত। গবেষক Sah (2022) নারীর এই অবদমিত অবস্থানের মূল কান্ডারী হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এই পিতৃতন্ত্র নারীর অগ্রগতি তথা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।[১] সাধারণ ভাষায় বুঝতে গেলে বলা যেতে পারে যে পিতৃতন্ত্র হল পিতার শাসন, যে শাসনের প্রভাবে পরিবার তথা সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধীনস্থ। বিশিষ্ট নারীবাদী কর্মী

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 333 - 341
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তথা সমাজবিজ্ঞানী Kamla Bhasin (1994) এঁর মতে, এই পুরুষ প্রভাব আসলে ক্ষমতা প্রদর্শনের সূচক যার সহজ শিকার নারী। এটি এমন একটি সামাজিক নির্মাণ যেখানে পুরুষ প্রভাবশালী ও নারী প্রভাবাধীন।[২] এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক Sylvia Walby-র বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়,

> "Patriarchy is a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women,"[৩]

অর্থাৎ পিতৃতন্ত্র হল এমন একটি সামাজিক কাঠামো ও অনুশীলনের ব্যবস্থা যেখানে পুরুষেরা নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে, তাদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। এই পিতৃতন্ত্র ক্ষমতা সম্পর্কের একটি উচ্চ-নীচ বিভাজন ও ভারসাম্যহীন কাঠামো দ্বারা নির্মিত যেখানে পুরুষেরা নারীর উৎপাদনশীলতা, প্রজনন, যৌনতা সহ সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজস্থ ব্যক্তিদের উপর পুরুষালী, নারীসুলভ প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্টেরিওটাইপগুলি আরোপ করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতা সম্পর্ক বজায় রাখে। এ প্রসঙ্গে ফরাসি দার্শনিক তথা নারীবাদী তাত্ত্বিক Simone de Beauvoir এঁর লেখা 'The Second Sex' (1949) বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-সভ্যতায় সমাজ দুটি লিঙ্গের নির্মাণ করেছে, যার প্রথমে স্থান পেয়েছে পুরুষ, দ্বিতীয় স্থানে নারী। এক্ষেত্রে তিনি 'আত্ম' ও 'অপর' ধারণার অবতারণা করে বলেছেন, আত্ম হলো কর্তা যে সর্বদাই অপরকে দমন করতে চায় এবং নিজের প্রয়োজনীয়তাকেই অপরিহার্য রূপে প্রতিস্থাপন করে অপরের সম্মুখে, এবং অপরকে গণ্য করে প্রয়োজন মেটাবার যন্ত্র বা উপায় হিসেবে। পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় এই 'আত্ম' ও 'অপর' হল যথাক্রমে পুরুষ ও নারী। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে শুরু করে সমস্ত সম্পর্কে এই বিভাজন (binary) বিদ্যমান। তিনি আরো বলেন, সমাজের সাথে সাথে পৌরাণিক গ্রন্থগুলিও নারীকে অপ্রয়োজনীয়, কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনকারী যন্ত্র, স্বামীর পরিচারিকা, ...রূপে উপস্থাপন করে। তাইতো তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রথম খন্ডে পুরুষের পক্ষপাতিত্ব ও নারীর বৈষম্যের শিকার হওয়ার নিদারুণ ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন,

> "কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না বরং নারী হয়ে ওঠে, অর্থাৎ পিতৃতন্ত্র ছাঁচে ঢালাই করে উৎপাদন করে একটি উপভোগ্য বস্তু নারী।"[৪]

তবে সভ্যতার আদিতে নারীর অবস্থান এমন অধঃগামী ছিল না। সে সময় নারী পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান ছিল। সময়ের সাথে সাথে পরিবার, সম্পত্তির মালিকানা প্রভৃতি ভাবনা যত সম্প্রসারিত হয়েছে ততই সমাজ প্রত্যাশিত লিঙ্গ ভূমিকা নির্মাণ ও তার অনুশীলন বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে Engels তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' (2010)-এ আধুনিক পরিবার গঠনে সম্পত্তির ভূমিকা অন্বেষণ করেছেন এবং আধুনিক সমাজ-সভ্যতায় পুঁজিবাদ ও পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের সহাবস্থান অনুধাবন করেছেন যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে তিনি কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-৩৩)-কে অনুসরণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজিবাদী ধারণার প্রেক্ষাপটে নারী ক্রমশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং পুরুষ আধিপত্যশালী হয়ে উঠেছে।[৫]

নারীর অবস্থানের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় এই চিত্র সর্বস্থান ব্যাপী। সেক্ষেত্রে, ভারতবর্ষ তথা বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধার যা একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও তেমন বদলায়নি। যদিও পর্যায়ক্রমে ভারতীয় নারীর অতীত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শুরুর দিকে নারীর অবস্থা এতখানি শোচনীয় ছিল না। গবেষক Patil (2021) এর মতে, বিশেষত বৈদিক যুগের প্রথম দিকে জ্ঞান চর্চা, কৃষি, কুটির শিল্প ইত্যাদিতে নারীর যোগদানের উল্লেখ মেলে। তবে ক্রমান্বয়ে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি জটিল হতে শুরু করলে নারী ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ হতে থাকে। ক্রমশ নারীর অবস্থা চরম রূপ নিতে শুরু করে। বিশেষত মধ্যযুগ ভারতীয় নারীর পরিপ্রেক্ষিতে এক অন্ধকারময় যুগ হিসেবে ধরা দেয়। পর্দা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ সব মিলিয়ে সেই সময় ভারত তথা বাংলায় নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে উনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশিক ভারতে বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক ও চিন্তকদের হাত ধরে শুরু হয় নানা কর্মকাণ্ড। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য যারা বাংলার নবজাগরণ তথা নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবেও পরিচিত।[৬] উক্ত সমাজ

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 333 - 341*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

সংস্কারকদের মধ্যে বেশিরভাগই ইংরেজি শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, ব্রাহ্ম বাঙালি ভদ্রলোক। এর পাশাপাশি, তৎকালীন সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজ সংস্কার, নারী মুক্তি আন্দোলন তথা নারী উন্নয়নের যাত্রাপথে অন্যতম নক্ষত্র হিসেবে মহীয়সী রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)-র নামও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় রোকেয়াকে নারী উন্নয়নের পথিকৃৎ হিসেবে অন্যান্যদের সাথে চিহ্নিত করা হয় না। রোকেয়া ছিলেন একজন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং নারীবাদী চিন্তক। উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা, যুক্তিবাদী চেতনা, গঠনমূলক সমালোচনা এবং উদ্যোগী ভূমিকার পরিচায়ক হলেও তাঁকে তৎকালীন তথাকথিত সমাজ সংস্কারক এবং নারী আন্দোলনের অন্যান্য পথিকৃৎদের ন্যায় প্রচারের আলোকে আসতে দেওয়া হয়নি, পার্শ্বস্থিত করেই রাখা হয়েছে। এমনকি সেই সময়ে দাঁড়িয়েও নারীর অবস্থান সম্পর্কে অসীম প্রগতিশীল ধারণা পোষণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি। শুধু তাই নয়, প্রথাগত নারীবাদী শিক্ষা না থাকলেও তাঁর সমাজ চেতনা, যুক্তিবাদিতা, উদ্ভাবনি শক্তি, স্বকীয়তা এ সবই সুগভীরভাবে ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। তাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত প্রবন্ধটি তাঁর ‘মতিচূর’ (১৯০৪) প্রবন্ধ সমগ্রের প্রথম খন্ডের অন্তর্গত। যেখানে তিনি নারীর পশ্চাৎপদতার কারণ ব্যাখ্যার সাথে সাথে স্বাবলম্বীতা অর্জনের মাধ্যমে সমাজে নারী পুরুষের বিভেদ মুছে সাম্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। এটি শুধুমাত্র তৎকালীন ভারতবর্ষ তথা বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে নয় গোটা বিশ্বের পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান নির্ধারণ এবং নারী মুক্তি তথা উন্নয়নের পথে অন্যতম দলিল, যার সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতাও বেশ তাৎপর্যবাহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে উক্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে লেখক দুটি মূল গবেষণা প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন এবং তার সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করছেন - নারী অবনমনের গোড়ার কারণ ও মুক্তির উপায় তথা উন্নয়নের দিগন্ত সংক্রান্ত মহীয়সী রোকেয়ার চিন্তা ভাবনা ও বিশ্লেষণ তাঁর ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ তে কিরূপে ধরা পড়েছে? এবং এর সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতাই বা কিরূপ?

মহীয়সী রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) অধুনা বাংলাদেশের রংপুর-এ এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অভিজাত পরিবারের সন্তান হলেও তিনি ছিলেন কন্যা সন্তান তাই সমাজের অন্যান্য মহিলাদের মতো তাঁর জীবনও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের জন্য প্রচলিত নানাবিধ প্রথা, নিয়মবিধি ইত্যাদির ঘেরাটোপে আবদ্ধ ছিল। আর পাঁচজন মেয়ের মতো তাঁকেও থাকতে হতো পর্দার আড়ালে, তাঁর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও ছিল কঠোর নিষেধাজ্ঞা। তবে শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল মুক্তির স্ফুলিঙ্গ। তাইতো বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ না থাকলেও তাঁর সদিচ্ছার জয় হয়েছিল। গভীর রাতে সকলের অগোচরে মোমবাতির আলোয় নিজের লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তার বিবাহ হয় খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন নামক একজন উচ্চশিক্ষিত, প্রগতিশীল, ভদ্রলোকের সাথে যিনি নারী শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় রোকেয়া নারীত্ব ও নারীর অবক্ষয়তার সমস্যা নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯০২ সালে শুরু হয় তাঁর সাহিত্যিক জীবন প্রথম রচনা ‘পিপাসা’ দিয়ে। এরপর একে একে প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কৌতুক লিখতে থাকেন। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির মধ্যে রয়েছে ‘মতিচুর’ প্রথম খন্ড (১৯০৪), দ্বিতীয় খন্ড (১৯২২); ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) এবং অন্যান্য। ইতিমধ্যে ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। ঐবছরই স্বামীর স্মৃতিরক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে পাঁচজন ছাত্রীকে নিয়ে তিনি চালু করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর পারিবারিক বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি আর ভাগলপুরে থাকতে পারেননি। এরপর ১৯১১ সালে তিনি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে ওয়ালিউল্লাহ লেনের ১৩ নম্বর বাড়িতে আটজন ছাত্রীকে নিয়ে পুনরায় চালু করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। ১৯১৭ সালে এটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও ১৯৩১-এ উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ১৯৩২-এ এটিকে ১৬২, লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত করা হয়; এরপর ১৯৩৮-এ ১৭, লর্ড সিনহা রোড এবং আলিপুর হাউজিং হাউসে স্থানান্তরিত হয় এবং অবশেষে এটি ১৭, লর্ড সিনহা রোডের নিজস্ব বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয় নারী মুক্তি, উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের স্বার্থে বিবিধ সভা, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ও নেতৃত্ব প্রদানকারীর ভূমিকা নিতেও দেখা গেছে তাঁকে।[৭]

নারীর সামাজিক অবস্থান ও অবনমনের কারণ অন্বেষণে রোকেয়া বলেন যে, নারী সমাজের অপরিহার্য অংশ হলেও এবং বিশ্বের অমোঘ সৃষ্টি গুলিতে তাদের ভূমিকা থাকলেও ভারতবর্ষ এমনকি গোটা বিশ্বের ইতিহাসে নারী একপ্রকার ব্রাত্য থেকে গেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী কখনো সমানাধিকার পায়নি, ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। সুরক্ষা, নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সমাজ ক্রমশ তাদেরকে অন্তঃপুরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে সেবা প্রদান, সন্তান প্রজনন ও প্রতি পালনের দায়ভার। আর সমাজের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে পুরুষ। নারী পরিণত হয়েছে পুরুষের দাসে। ফলে ক্রমেই নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থাতেও এই ধারা জারি থেকেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে Martha Nussbaum তার "Women's Capabilities and Social Justice" (2000) লেখাটিতে বলেন যে, শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে আজও গোটা বিশ্বে নারীর মৌলিক মানবিক চাহিদা সম্পন্ন কার্যাদি সাধনের ক্ষেত্রেও সমর্থনের অভাব রয়েছে।[৮] যদিও এবিষয়ে রোকেয়া বহু আগেই আলোকপাত করেছেন। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর  সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধটির সূচনা পর্বে নারীর এই রূপ অধস্তন অবস্থানের বিশ্লেষণ করেছেন এক নিখাদ প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী!"[৯] তিনি বলেন, সভ্যতার শুরুতে নারী পুরুষের ভেদাভেদ ছিল না। তবে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানবজাতির একটি অংশ পুরুষ যাবতীয় উন্নয়নের সিঁড়ি পেরোলেও, নারী তা পারেনি। আর এই না পারার কারণ হিসেবে তিনি সুযোগের অভাবের কথা বলেছেন। নারীকে যেভাবে সমাজ সংসারের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে তাতে নারী শিক্ষা, কর্ম, সম্পদ সহ বহির্জগৎ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে। এই সূত্রে পুরুষরা একদিকে যেমন নারীকে অক্ষম-অকর্মণ্য বলে চিহ্নিত করেছে, অপরদিকে তাদের ওপর নারীর নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করেছে। নারী মননও পরনির্ভরশীলতা স্বীকার করে দাসত্ব বরণ করেছে। একে রোকেয়া ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন, ভিক্ষুক যেমন ভিক্ষা পেতে পেতে একটা সময় ভিক্ষাবৃত্তিকেই জীবিকার একক উপায় হিসেবে গন্য করে এবং তাতে লজ্জা বোধ করেনা তেমনি নারীও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে পরনির্ভরশীলতাকেই তার ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে। রোকেয়া নারীর এই দাসত্বের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে অলংকারের ঘেরাটোপ কে তুলে ধরেছেন। যে অলংকার নারীরা আভিজাত্য, সৌন্দর্য, আবেগ-অনুভূতি, শ্রদ্ধা, পরিচিতি প্রদর্শনের জন্য পরিধান করে সেই অলংকার যে আসলে নারীর পরাধীনতার শৃঙ্খল সেকথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। এসব আসলে মিথ্যা সংস্কার, ভালোবাসা কিংবা আবেগের দোহাই দিয়ে নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা, তার বাক নিয়ন্ত্রণ করা সর্বোপরি তাদের মুষ্টিবদ্ধ রাখার কৌশল। তাইতো রোকেয়া বলছেন,

> "কারাগারে বন্দীগণ পায়ে লৌহ নির্মিত বেড়ী পরে (আমরা আদরের জিনিষ বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ী লৌহ-নির্মিত আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি! বলাবাহুল্য লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না। কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহাদের অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেই রূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি 'হার পরিয়াছি'। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকাদড়ী' পরায় এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে 'নোলক' পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছ 'স্বামী'র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন!"[১০]

রোকেয়া এই অলঙ্কার প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলছেন এই অলংকার দাসত্বের প্রতীক হলেও যার কাছে এর পরিমাণ যত বেশি তিনি সমাজে ততই মান্যবর। আসলে এটি সামাজিক নির্মাণ। এর অন্তস্থিত রূপক উদঘাটনে নারী অপটু। তাই তো পুরুষ তাদেরকে সহজে এর দ্বারা মোহিত করতে পারে। আবার অনেকে এই গহনাকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করে। রোকেয়া বলছেন এই বিষয়টিও নিন্দনীয়। সৌন্দর্যায়নের চেষ্টাকেও তিনি মানসিক দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ পুরুষেরা এই সৌন্দর্যের উপায় দ্বারা নারীকে প্রলভিত করলেও আদোতে এগুলিকে 'পরাজয়ের নিদর্শন' বলেই মনে করে। তাইতো তারা কোন তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ 'চুড়ি' পরার তুলনা টানে। শুধু গহনার প্রলোভন নয় পুরুষ নারীকে আগলে রাখা, রক্ষা করা, ভালোবাসা ইত্যাদির মতো আবেগী দোহাই দিয়ে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে, ভয় দেখায়। তবে নারী এই রাজনীতি বুঝতে না পেরে ক্রমশ দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাইতো রোকেয়া বলছেন,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 333 - 341
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি।"[১১]

নারীর এই দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার নেপথ্যে রোকেয়া প্রচলিত স্টেরিওটাইপগুলিকে দায়ী করেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নিয়মের বেড়াজাল যেভাবে নারী ও নারীত্বের চরিত্রায়ন করেছে এবং নারীরা অনুশীলনের নিরিখে সেগুলিতে সিলমোহর দিয়েছে তা কেবল লজ্জাজনকই নয়, ঘৃণ্যও বটে। তিনি বলেন 'নাকি কান্না', 'ভীরুতা', 'পুরুষের মুখাপেক্ষীতা' কেবল এসবই যেন নারীর বৈশিষ্ট্য, অথচ মজার বিষয় হলো যাদের দরুন এসব সেই পুরুষেরাই আবার এই সকল আচরণের কারণে নারীকে বিদ্রুপ করে; নির্বোধ, লোভী, আত্মকেন্দ্রিক বলে সমালোচনা করে! তার বিচরণ, চাওয়া-পাওয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদের দিকগুলি উপেক্ষিত হয়। আর নারী তা বুঝতেও পারে না। তাইতো সেই সময়ে নারীর করুন বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনা করে তিনি বলেছেন,

> "আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না।"[১২]

এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আসলে তিনি তৎকালীন সমসাময়িক পরিস্থিতিতে নারীর বন্দিদশার কথা বলছেন। সে যুগে বহির্জগতে নারীর বিচরণের অধিকার ছিল না, তার স্থান ছিল অন্তঃপুরে। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে কারাগারে থাকা বন্দীর ন্যায় তাকে জীবনযাপন করতে হতো। সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর পরিচর্যা, গৃহস্থালির কাজ ইত্যাদিতেই সীমিত ছিল তাদের জীবন। বিদ্যালয় যাওয়াতো দুরস্ত জ্ঞান চর্চার অধিকারও তাদের ছিল না, এমনকি কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকারও তাদের ছিল না। তবে তিনি মনে করতেন মননে যদি জ্ঞানের আলো থাকে তাহলে সেই আলোকেও আলোকিত হওয়া যায়। আবার সে যুগের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারীর জ্ঞান চর্চার সুযোগ না থাকা এবং জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার দিকটিতে ও আলোকপাত করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি আক্ষেপের সুরে এক স্থানে বলছেন,

> "পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যায়ন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞান রূপ সুধাভান্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত হইবে কি?"[১৩]

আসলে তিনি তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অভিমান থেকে একথা বলছেন। উক্ত সমাজ ব্যবস্থার শাসক, আইন প্রণেতা, শিক্ষা ব্যবস্থার নির্ধারক প্রমুখের প্রতি প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন তিনি। সেই সময়ে সমাজসংস্কার, নারী মুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির অবদান থাকলেও নারীকে নিয়ে এমন ভাবনা দৃঢ়তার সাথে ফুটে উঠেছিল রোকেয়ার কলমে। ক্রমে তিনি নারী মুক্তি-নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন নারীর এই অবস্থার শেষ কোথায়? কবে নারী সমানাধিকার পাবে? এক্ষেত্রে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র নারী জাতির অধিকারের কথা বলেছেন।

তিনি এখানেই থেমে থাকেননি বরং নারীর এই অধস্তন অবস্থার কারণ অন্বেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই তিনি যে কারণটির কথা বলেছেন তা হলো কুসংস্কারাচ্ছন্নতা। তিনি দ্যর্থ অর্থে জানিয়েছেন নারী শিক্ষা সম্পর্কে অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। পুরুষ শাসিত সমাজ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলছেন,

> " 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন।"[১৪]

অর্থাৎ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সেই সময় শিক্ষাকে যেভাবে পুরুষের একচেটিয়া করে রাখা হয়েছিল এখানে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন রোকেয়া। তিনি বলেছেন নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইলে প্রথমে সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। পুরুষ শাসিত সমাজকে বুঝতে হবে নারীরাও মানুষ। তাদেরও জ্ঞানার্জনের, স্বাবলম্বিতার সর্বোপরি মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার রয়েছে। এরই সাথে নারী অবনমনের দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি যে কথা বলছেন তা হলো শিক্ষাকে চাকরি লাভের একটি পন্থা মনে করা। তাই তিনি বলছেন,

> "আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকরী লাভের পথ মনে করে।"[১৫]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 333 - 341*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্য তো শুধুমাত্র চাকুরী লাভ নয়, শিক্ষাই তো মানুষের মনন-চিন্তনের বিকাশ ঘটায়। অথচ উপনিবেশিক ভারতে যেভাবে শিক্ষাকে চাকুরী লাভের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হলো সেই সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা স্বাভাবিকভাবেই নারী শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। তার কারণ তৎকালীন সমাজ নারীর বহির্জগতে পদার্পণকে মান্যতা দিত না, সেখানে তার চাকরির ভাবনা ভাবাও একরকম অপরাধ ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন,

"মহিলাগণের চাকরী গ্রহণ অসম্ভব সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনবশ্যক।"[১৬]

আসলে সমাজ-সংসারে পুরুষেরাই রোজগেরে ভূমিকা পালন করে, সংসার চালায়। আর নারীর বাস অন্দরমহলে, বাহিরে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন তার কাজ নয়। এটাই পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি। সুতরাং বহির্জগতে পরিচিত হওয়া, শিক্ষালাভ এসব যেন নারীর জন্য নয়! এখানে তিনি নারী অবনমনের আরও একটি কারণ হিসেবে নারীর পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। রোকেয়া শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকেই প্রশ্ন করেননি বরং তার সাথে নারীর আত্ম-সমালোচনা করে বলছেন নারী যেহেতু উপার্জনে অক্ষম এবং পুরুষের ওপরে নির্ভরশীল তাই তাকে পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার করতেই হয়। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে।"[১৭]

তিনি বলছেন সেই ব্রাহ্মণ্য যুগ থেকে অদ্যাবধি নারী পুরুষের দাসত্ব মেনে চলেছে, আর যতদিন পর্যন্ত এই প্রভুত্ব স্বীকারের মানসিকতা নারীর মধ্যে থাকবে ততদিন তার উন্নয়ন সম্ভব নয়। অন্যদিকে আবার কিছু উদাহরণের নিরিখে তিনি বলেন, এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলারা দাসিবৃত্তি করে সংসার চালায়, এবং সেক্ষেত্রেও সংসারের অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার কোন ব্যক্তি যদি নিজে উপার্জন না করে বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারীণীকে বিবাহ করেন সেক্ষেত্রে তিনিও তার স্ত্রীর ওপরে প্রভুত্ব কায়েম করে থাকেন, আর তার স্ত্রীও তা মেনে নেন।[১৮] এর মধ্যে দিয়ে এক দিকে যেমন তিনি কেবলমাত্র পুরুষের রোজগারের ওপর নির্ভরতার কারণেই যে নারী তার প্রভুত্ব স্বীকার করে - এই বিষয়টি খন্ডন করেছেন, তেমনি আবার উচ্চ মানসিক প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে নারীর যেকোনো পরিস্থিতিতে পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করার মানসিকতার সমালোচনাও করেছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর এইরূপ অবস্থান থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহীয়সী রোকেয়া সেযুগে দাঁড়িয়েও কতিপয় উপায়ের কথা বলেছেন। যার প্রথমেই তিনি বলেছেন আত্মবিশ্বাস স্থাপনের কথা। তিনি বলছেন নারীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে, তাই তাকে প্রথমে নিজের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। উক্ত প্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন,

"আমরা যে গোলামজাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।"[১৯]

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন নিজের উপরে বিশ্বাস রেখে দলদাস বৃত্তি থেকে মুক্ত হতে। দ্বিতীয় উপায় হিসেবে তিনি জীবিকা অর্জনকে নারী স্বাধীনতা লাভের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

"যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।"[২০]

এর মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন নারী যেহেতু আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর নয় তাই তাকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে হয় যাবতীয় বিষয়ের জন্য। তবে তারা যদি এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারে, সাবলম্বী হতে পারে সেক্ষেত্রে তাদের দাসত্ব ঘুঁচবে। তাই তিনি নারীকে জীবিকা অর্জনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি সমাজের উচ্চ আসন গুলিতে নারীকে আসিন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, বিদ্যা চর্চায় জোর দিতে বলেছেন। সমাজের যাবতীয় ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্যকারী ভূমিকার অবসান ঘটিয়ে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলেছেন। তাইতো তিনি এক স্থানে লেডি ভাইসরয়ের তুলনা টেনে বলেন,

"লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রাণী' করিয়া ফেলিব।"[২১]

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন নারী যদি সমাজের উচ্চপদে আসীন হয় সেক্ষেত্রে তার মান্যতা বাড়বে, সমগ্র নারী সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হবে। এছাড়া তিনি নারী স্বাবলম্বিতার পথে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদির মত বিকল্প পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে বলেন, সর্বদা সমাজের উচ্চ ক্ষেত্রগুলিতে আসীন হতে না পারলেও নারী যেন তার পরিশ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে বিকল্প

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 333 - 341*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

পদ্ধতিতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তাহলেও তাকে আর পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। এক্ষেত্রে তিনি নারীর শিক্ষা চর্চার ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ শিক্ষাই পারবে নারীর যুক্তি ও মননের বিকাশ ঘটিয়ে নিজের অবস্থান সম্পর্কে তাকে সচেতন করতে। শিক্ষাই পারবে নারীকে সর্বপ্রকার উপেক্ষা থেকে মুক্ত করে সমাদর এনে দিতে। তাই রোকেয়া দ্ব্যর্থ অর্থে বলছেন,

> "একবার জ্ঞান চর্চা করিয়া দেখি তো এ অনুর্বর মস্তিষ্ক সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।"[২২]

এ জগতে সকল সফল ব্যক্তিরা জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই সফলতা পেয়েছেন। নারী শিক্ষিত হলে সচেতন হবে, তবেই তার চরম পরিণতির অবসান ঘটবে এবং সমাজে পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। আর এক্ষেত্রে তার আত্ম প্রচেষ্টা সর্বাধিক জরুরি। তাইতো রূপক অর্থে রোকেয়া বলছেন,

> "ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্য করে,
> (God helps those that help themselves)"[২৩]

এভাবেই রোকেয়া উক্ত প্রবন্ধে নারী মুক্তি তথা উন্নয়নের দিগন্ত বিশ্লেষণ করেছেন।

নারী-পুরুষ উভয়ই সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সকলকেই সামিল হতে হবে। পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে এই উন্নয়ন থেকে বাদ রেখেছে। বাস্তবিকভাবে গোটা বিশ্বের নিরিখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক চর্চা সবেতেই আজও পুরুষের তুলনায় নারীর অনুন্নত অবস্থানের প্রতিচ্ছবিই ধরা পড়ে। অথচ সমাজে নারী-পুরুষের আক্ষরিক স্বার্থ ও লক্ষ্য কিন্তু এক। পরিবার তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয়েরই ভূমিকা সমান হওয়া উচিত। একটি শিশুর জীবনে যেমন তার পিতা-মাতা উভয়েই সমান প্রয়োজন, তেমনি সমাজে নারী-পুরুষ একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই রোকেয়া শুধুমাত্র নারীকে নয় সমাজের প্রত্যেক প্রতিনিধিকে এই পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহাবস্থানের কথা বলেছেন। নারীর উন্নয়নে পুরুষকেও সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পুরুষ ও নারীর মিলিত প্রয়াসে সমাজের অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। তাই 'স্ত্রীজাতির অবনতি'র একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি লিখছেন,

> "জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন তাহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন।"[২৪]

নারীও যেন পুরুষের ন্যায় তার পরিশ্রমী ও উদ্যোগী ভূমিকার নিরিখে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র পুরুষের সহধর্মিনী নয়, সহকর্মী ও সহমর্মী হয়ে ওঠে এই আহ্বান জানিয়ে তিনি বলছেন,

> "আমাদের উচিত যে তাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্ম্মিণী সহধর্ম্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হইনাই, একথা নিশ্চিত।"[২৫]

উক্ত লিখনের মধ্যে দিয়ে রোকেয়া নারী জাগরণের কথা বলেছেন, ভারতবর্ষ তথা বাংলার নারী মুক্তি আন্দোলনের দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

সময় এগিয়েছে, সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে, তবে আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নারী উন্নয়নের কথা আলোচনা করতে গেলেও শুরুতেই তার অবদমিত অবস্থানের বর্ণনা দিতে হয়। কারণ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও তার অবস্থানের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকি নারীর মৌলিক-মানবিক চাহিদাগুলিও এই পুরুষ শাসিত সমাজে আজও উপেক্ষিত। এ প্রসঙ্গে, সমসাময়িক সমাজে নারীর অবস্থানের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশিষ্ট নারীবাদী দার্শনিক Martha Nussbaum এর লেখা "Women's Capabilities and Social Justice" (2000) এ। সেখানে তিনি বলেন, সাক্ষরতা, পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সবেতেই নারী পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এমনকি আইনি অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী অসাম্যের শিকার। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকেও নারী বঞ্চিত। এভাবেই অসাম্য ও সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি অসম মানবিক সক্ষমতা প্রদান করেছে। এই সমাজে নারী মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পায় না, বরং ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। আজকের পরিবর্তিত

পরিস্থিতিতেও প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল নারীকে আবদ্ধ রেখেছে, জীবনের প্রতিটি স্তরে পুরুষের ওপর তার নির্ভরশীলতাকে নিশ্চিত করেছে। বিশ্বব্যাপী নারী মুক্তি তথা উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি ও উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে জাতিপুঞ্জের তরফে নারী উন্নয়ন তত্ত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বিশ্বের দরবারে সেগুলির কার্যকারিতা ও ফলাফল প্রতিবেদনের আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এরপরেও সম্পূর্ণ মানবিক জীবনযাপনের জন্য নারীদের অপরিহার্য সমর্থনের অভাব রয়েছে। এই সমর্থনের অভাব প্রায়শই তাদের নারী হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মতো সংবিধানিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও নারী কেবল তত্ত্বগতভাবে সমান, বাস্তবে তারা বিবেচিত হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে।[২৬]

সর্বপরি বলা যায়, ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ প্রবন্ধে রোকেয়া তাঁর বক্তব্যের রূপকে নারীর ক্ষমতা অর্জন; সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে অর্থাৎ সমাজের যাবতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলেছেন। আসলে এর মধ্যে দিয়ে তিনি নারী মুক্তি তথা ক্ষমতায়নের দিগন্ত উন্মোচনের দাবি করেছেন। এই ক্ষমতায়নের মূল সূচক হল ‘ক্ষমতা’, যার প্রভাবে কেউ ক্ষমতাশালী, আবার অভাবে ক্ষমতাহীন। এই দুইয়ের মধ্যে সর্বদাই উচ্চ-নীচ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে Srilatha Batliwala (2007)-র ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত ধারণা অনুসরণ করে বলা যায়, ক্ষমতায়ন হলো একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠী বা উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্কের বদল নির্দেশ করে। এই ক্ষমতা সম্পর্ক একটি বিমূর্ত ধারণা যার সাথে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়গুলি সম্পর্কিত, যা মূল ধারার ক্ষমতা কাঠামোকেই প্রচার করে। এতে ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্যগুলি যথা- অভিগম্যতা, সক্ষমতা, সামর্থ্য, অংশগ্রহণ ইত্যাদি গুরুত্ব হারায়।[২৭] পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতা সম্পর্কের নিরিখে সৃষ্ট দুই গোষ্ঠী- ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাহীন যথাক্রমে পুরুষ ও নারী। এখানে পুরুষ সকল প্রকার ক্ষমতায় আসীন ও নারী আজও নিয়ন্ত্রিনাধীন। তৎকালীন সময়ে এই প্রেক্ষাপটে রোকেয়া তাঁর ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’তে পুরুষের ন্যায় নারীর যেরূপ উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা সমন্বিত উদ্যোগের ফলস্বরূপ অনেকাংশে পূরণ হলেও, এই পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আজও নারী যেভাবে লিঙ্গ রাজনীতির শিকার তাতে করে প্রশ্ন ওঠে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সত্যিই ঘটেছে কি?

## Reference:

১. Sah, Sapna. “Patriarchy and the Identity of Women in Indian Society”, *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research,* vol. 9, issue. 8, 2022, pp. f596-f603, https://www.jetir.org/papers/JETIR2208563.pdf

২. Bhasin, Kamla. *What is Patriarchy?* 2nd ed., Kali for Women, 1994.

৩. Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy.* Reprinted., Basil Blackwell Ltd, 1991, p. 20

৪. Simone de Beauvoir, Simone de. *The Second Sex,* (দ্বিতীয় লিঙ্গ). অনু. হুমায়ুন আজাদ, সং. ২, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১৪

৫. Engels, Friedrich. *The Origin of the Family, Private Property, and the State.* Penguin Classics, 2010.

৬. Patil, Dr. Ramesh H. “The Social Status of Indian Women of Different Periods in the Patriarchal Society”. *Research Ambition: An International Multidisciplinary e-Journal,* vol. 5, no. 4, 2021, pp. 1-9. https://doi.org/10.53724/ambition/v5n4.06

৭. Roy, Arnab Kumar. “Educational Thoughts of Begum Rokeya and the Contribution in the Upliftment of Women Education in Bengal”. *International Journal of Research in Social Sciences,* vol. 9, issue. 3, 2019, pp. 149-156

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 333 - 341
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. Nussbaum, Martha. "Women's Capabilities and Social Justice". *Journal of Human Development,* vol. 1, no. 2, 2000, p. 242

৯. হোসেন, সাখাওয়াত, বেগম রোকেয়া. "স্ত্রীজাতির অবনতি", রোকেয়া রচনাবলী, পুনঃ সংস্করণ., বাংলা একাডেমি, ঢাকা,  স. আবদুল কাদির, ২০০৬, পৃ. ১১

১০. তদেব, পৃ. ১৩-১৪

১১. তদেব, পৃ. ১৫

১২. তদেব, পৃ. ১৮

১৩. তদেব, পৃ. ১৮

১৪. তদেব, পৃ. ১৮

১৫. তদেব, পৃ. ১৮

১৬. তদেব, পৃ. ১৮

১৭. তদেব, পৃ. ২০

১৮. তদেব, পৃ. ২০

১৯. তদেব, পৃ. ২১

২০. তদেব, পৃ. ২১

২১. তদেব, পৃ. ২১

২২. তদেব, পৃ. ২২

২৩. তদেব, পৃ. ১৯-২০

২৪. তদেব, পৃ. ২২

২৫. তদেব, পৃ. ২২

২৬. Nussbaum, Martha. "Women's Capabilities and Social Justice". Journal of Human Development, vol. 1, no. 2, 2000, pp. 219-247

২৭. Batliwala, Srilatha. "Taking the Power out of Empowerment: An Experimental Account". *Taylor & Francis Ltd .* Vol. 17, no. 4/5, 2007, pp. 557-565